একটি অস্থায়ী পরীক্ষা
অরুনন্ধতী রায়চৌধুরী

রসিক মজুমদার আজ আবার একটা নতুন পরীক্ষা দিতে এসেছেন। ভীষণ কঠিন পরীক্ষা। ভারতবর্ষ জুড়ে এ পরীক্ষায় শেষমেষ স্থান পায় শখানেক ছেলে মেয়ে। পরীক্ষার্থীদের বয়ঃসীমার কোন পাবন্দি নেই। বসিক বাবুর বয়স পঞ্চাশ। সরকারি চাকুরে। বিপত্নীক। কঠিন কঠিন পরিক্ষা দেওয়া তাঁর বাতিক, শখ। অভ্যাস। আর পাশ করে যাওয়াটা অবহেলায় পড়ে থাকা আত্মপ্রসাদের মতো একটা কিছু। তাঁর সঙ্গীসাথীরা বলে, বেরসিক বোঝদার। রসিকবাবু এ নামকরণে খুশি তো বটেই, গর্বিতও সামান্য। কারণ কঠিন পরীক্ষায় আকৃতকার্য তিনি আজ আবধি হননি। বরং সহজ পরীক্ষা মত দিয়েছে কয়েকবার।

আজকের পরীক্ষাখানা হচ্ছে সরেস। প্রশ্নপত্র বেজায় কঠিন। আশপাশের ছানিতানুগুলো এক্কেবারে নাস্তানাবুদ হচ্ছে। বাপ মায়ের হাজার হাজার টাকা ধ্বংস করে তো কোচিং এ খুব নেট পর‍্যাক্টিস করেছিস। কিন্তু আসল সময়ে দ্যাখ। কেমন খাবি খাচ্ছে। এসব পরীক্ষার জন্য চাই একধরনের জেদী নেশা...হার না মানার নেশা। এ নেশার জোরে তিনি জয় করেছেন পত্নী – বিয়োগ – দাদাদের মুখের ওপর সম্পত্তির স্বত্ব ছেড়ে দেওয়া। শুধু একটা তারিখ...ওই তারিখে পরীক্ষা না থাকলে তিনি নিজেই নিজের পরীক্ষা নেন, অধ্যাপক বন্ধু বিন্দুসারকে দিয়ে প্রশ্ন তৈরি করিয়ে। চোখ লাল করা প্রশ্ন, মরুভূমিতে জল পাওয়ার শেষ ইচ্ছেটা মিলিয়ে যাবার মতো প্রশ্ন, বুকের বাঁ পাঁজর ভেঙে নিষিদ্ধ হাতিয়ার ঢুকে যাবার মতো প্রশ্ন... অথবা নিমেষে একটা তারিখে চ্যালেঞ্জও করার মতো প্রশ্ন?

উত্তরপত্র হাতে পাতে এসে গেছে। পাশের ছেলেটা ঘন ঘন ঘাম মুছছে, বিশেষ কায়দা করতে পারছে না। রসিকবাবুর অভ্যস্ত চোখ সব বোঝে। তাঁর সামনের মেয়েটিতো প্রথম পাতার নিয়মাবলী ও শর্ত বুঝতেই বেলা কাটিয়ে দেবে বলে মনে হচ্ছে, পূরণ করাতো দূর অস্ত। একজন কড়া ধাতের দিদিমনি পরীক্ষা তদারকি করছে। বয়স আন্দাজ চব্বিশ – পঁচিশ হবে। চোখে চশমা, মুখ গম্ভীর। সামনে হলের এ মাথা থেকে ও মাথা হানটান করে যাচ্ছে। বাচ্চাগুলো একটু হেলদোল করলেই বজ্র কঠিন স্বরে বলছে,
নো টকিং।
আরও নানা প্রকার হুমকি. বীর হৃদয় চুপ্‌সে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। দিদিমনিটি বিবাহিত কি না বোঝা যাচ্ছে না। আজকালকার শহুরে মেয়েদের এই সুলক্ষণটি অতি প্রকট। সবার অ্যাডমিট কার্ড মিলিয়ে খাতায় সই করছে। এসব পরীক্ষার খাতার আবার কায়দা আছে বিস্তর, নাম লেখার আইন কানুনও বেজায় জটিল। এ ঘরে শেষ রোল নাম্বার রসিক বাবুর। দিদিমনি প্রাঞ্জল ভাষায় খাতা পূরণের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন প্রথমেই। ভালো করে শুনলে ভুল হবার কথাই না। তবু বিস্তর ভুল করছে ছানু ভানুরা, আর ঝাড়ও খাচ্ছে দেদার। রসিকবাবুর সামনের ছেলেটিকে তো খাতা ক্যান্সেল করে নতুন খাতা দিতে হয়েছে। তার আগে আরও দুর্জনের। রসিকবাবু নিশ্চিন্ত। দিদিমনি কনামাত্র ভুল ধরতে পারবে না তার খাতার। তাঁর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে শক্তপোক্ত দিদিমনি। বেজায় খুশবু মেখে এসেছে।
–আপনার খাতা তো ক্যান্সেল হয়ে যাবে।

চম্‌কে ওঠেন রসিকবাবু। এভাবে হয় নাকি? মানুষ জীবনে কতবার খারিজ হয়? তাঁর খাতা বাতিল হয়ে যাবে? আর তিনি? স্ত্রী বাতিল করেছে মৃত্যুকে, পারিজাত তো থাকতে পারত। থাকল না তাঁর নিজের মেয়েটা ওই নভেম্বরেই বাপের সাথে ঝগড়া করে মুম্বাইতে চাকুরিটা নিল। বাবাকে ফোন করেছিল মেয়েটা – তারপর ভীষণ শব্দ। বাপ্‌কে খারিজ করে চলে গেছে মায়ের কাছে। কলকাতায় পড়তে টিউশানি করত পারিজাত। প্রথম মাইনে গুলো জমিয়ে তাঁকে একটা দামি ফাউন্টেন পেন উপহার দিয়েছিল, কিউরিও শপ থেকে। ওটাও খারিজ করে দেবে বলছে। মরিয়া হয়েই রসিক বাবু বললেন,
–কেন বলুন তো? আমি তো সব ইন্‌স্টাক্শান প্রপারলি ফলো করেছি।
ফাউন্টেন পেন আপনারা অ্যালাও করেন না?
–না। কালো বলপেন ছাড়া অন্য কোন পেন দিয়ে লেখা অ্যালাও করা হয় না। আপনি বোধহয় এই ইনস্ট্রাকশানটা খেয়াল করেননি।
–কেন অ্যালাও করা হয় না?
দিদিমনির গলাটা কি সামান্য ভিজল?
সেটাই নিয়ম।

রসিকবাবু ফ্যালফ্যাল করে পারিজাতের দেওয়া পেনটার দিকে তাকিয়ে থাকেন। বকল না দিদিমনি, খাতা বদল করে এনে বলল,
–কালো বল্ পেন দিয়ে লিখুন। বেশিক্ষণ সময় যায়নি।
–আমার কাছে যে আর কোনো পেন নেই মা।
অজানতেই কথাগুলো বেরিয়ে এলো তাঁর মুখ থেকে। তাঁর শরীর খারাপ লাগছে। হাত দুটো অসম্ভব কাঁপছে। পেন ধরাই সম্ভব নয়.. এত অসহ্য সেই খারিজ হওয়া দেখলেন, দিদিমনিই তাঁর অ্যাডমিট কার্ড দেখে প্রায় সবটাই পূরণ করল। সই করবার জায়গাটা দেখিয়ে দিলে বলল,
–আমার পেনটা সাধারন বল পেন। এটা দিয়ে পরীক্ষাটা দিন। লেখা শুরু করুন।
হাত কাঁপাটা বশ মানছে না। দিদিমনি তাঁর কাধে আল্তো হাত রেখে বলল,
–এমন করতে নেই। ছিঃ। ছোটরা কী বললে? সবাই হাসবে না? যদি আমি বকি।
অবিকল পারিজাত। তাঁর ইচ্ছে হলো পারিজাতের ফাউন্টেন পেনটা পারিজাতকেই দিয়ে যাবেন। রসিকবাবু অনভ্যস্ত হাতে কালো বল্ পেন –এ লেখা শুরু করলেন।

২

এবার হলে তিনবার এই প্রবেশিকা পরীক্ষায় ফেল করবে আর্য। আর ফেল তো সে করবেই। বাপটা মাতাল, মা-টা ছেনাল, কিন্তু দুটোই রোজগার করে দেদার। দুটো নামজাদা কলেজে পড়ায় দুজন। ধ্যামা সাবজেক্ট –ফিসিক্স আর সাইকোলজি। মা যে কী করে সাইকোলজি পড়ায় সেটা একটা বিস্ময় আর্যর কাছে। তাদের বাড়ির নাম মালঞ্চ। আর্য বলে। মাল আথবা মঙ্ক। এই ঝাঁটের পরীক্ষার জন্য ঘাড় ধরে নামী কোচিং –এ ভর্তি করেছিল মা-বাবা। এই একটা ব্যাপারে মাল আর মঙ্কের মধ্যে কোনো দ্বৈরথ হয় না। শালা, সব বাঁশ ওর পেছনে। মাঝখানে থেকে শৈলেশদার কাছে পোট্রেটে হাত পাকানোটা আর হলো না। ন্যুড সেশানের মাঝ পথ থেকেই ওকে টেনে হিঁচড়ে বার করে আনলো বীরেন চাটুয্যে, তার বাপ। চারকোল স্কেচে ন্যুড প্রতিকৃতি আঁকা যে কী ভীষণ নেশার ব্যাপার, তা কি আর মদো মাতালরা বোঝে? শৈলেশদার স্টোন ব্লকের ওপর চারকোল দিয়ে যখন নগ্ন নারীকে আবিস্কার করতেন, মনে হতো ধ্যান করছেন – আর নারীর প্রতিকৃতিটি বুঝি তাঁর আরাধ্য পৃথিবী। ওটাই চায় আর্য, তার পৃথিবী।

প্রথম দিকে ভীষণ অস্বস্তি হতো, ন্যুড মডেলকে পোড়া দিয়ে বসিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা আঁকতে। সিনিয়াররা বলেছিল,
–শুয়ে নিস, ভালো ডেপ্থ পাবি।
গা ঘিন্ ঘিন্ করে উঠেছিল আর্যরা। বেশ হোঁচট খেতে হচ্ছিল সেই সময় আর্যকে। তখনই শৈলেশ বায় আর্ট কলেজে জয়েন করলেন। হয়ত আর্যকে সবার মধ্যে একটু বেশি জড়োসড়ো দেখে বেশি করে লক্ষ্য করেছিলেন শৈলেশদা। অল্প কিছু দিনের মধ্যে ভাবটা জমে গিয়েছিল। নিজের বাড়িতে নানা ধরনের ওয়ার্কশপ করাতেন শৈলেশদা। ডাক পাঠাতেন আর্যকে। প্রথম প্রথম সাধারণ পোট্রেট করত আর্য, ছবি থেকে আঁকা ছবি। একদিন দুপুর বেলা শৈলেশদার স্টুডিওতে বসে একটা প্রোট্রেট করছিল আর্য। এক মহিলার মুখ অদ্ভুত সুন্দর, ভীষণ শান্ত চোখ, একটা কী ভীষণ বিষাদ রহস্যের সঙ্গে জট পাকিয়ে আছে সারাটা মুখে, ঠোঁটে, চোখে... ছবিটা জীবন্ত হলো, বলল,

–আমি তনি, শৈলেশ রায়ের কেপ্টের মেয়ে।
আবাক চোখে আর্য দেখেছিল, আবিকল একই মুখের আদলে গড়া একটি মেয়ে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, নাম বলছে তনি, পরিচয়ে শৈলেশদার রক্ষিতার মেয়ে। মেয়েটা বেশ ঘনিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আরও এগিয়ে এলো। উষ্ণ নিঃশ্বাস ভিজিয়ে দিচ্ছিল আর্যকে। নিমগ্নতার গ্লানির স্বর্ণচূড়া স্পর্শ করতে করতে শুনে ছিল আর্য।
–নারীকে না ছুঁয়ে তাকে আঁকবে কী ভাবে?
এরপর অনেকবার ছুঁয়েছে সে তনিকে– ভ্রুভঙ্গ, নাক, ঠোঁটের ভাঁজ, আঙ্গুলের কোন...বাহুমূল, স্ফীত স্তন, নাভি, উরু, কটিভঙ্গ জঙ্ঘ... সব আলাদা আলাদা ক্যানভাস, ডান হাতে ধরা পদ্মকলি বামস্তন ঢেকে রেখেছে, পদ্মমৃণাল নাভিমূলে...সেদিন রঙের পালা ছিল। আর্যর অনভ্যস্ত অয়েল পেন্টের। সুষুপ্তির ভেতর থেকে বীরেন চাটুয্যে আর তনির কর্কশ ঝগড়া শুনেছিল আর্য।
–ইউ ব্লাডি হোর। আমাকে ব্ল্যাকমেইন করার জন্য আর্যকে ধরেছিল।
–তনিকে শঙ্খিনীর মতো হয়ে যেতে দেখে ছিল আর্য শুনেছিল হিস্হিয়ে গলায় বলছে তনি,

–এইচ. আই. ভি ক্যারিয়ার হয়েও তোর ছেলেকে কাৎ করিনিরে হারামি।
আর্ঘ পালিয়ে এসেছিল। ধরা পড়েছিল। রিহ্যারসে ছিল। এখনও আর্য তার পৃথিবী খুঁজছে।

–রোল নাম্বার ৩৬৫৩৬৫ (থ্রি সিক্স ফাইভ থ্রি সিক্স ফাইভ)। সম্বিত ফিরে পেল আর্য। সে এখন প্রবেশিকা পরীক্ষায়। ইনভিজিলেটার ম্যাম্ বিরক্তি আর বিস্ময় নিয়ে বলছেন,
–আন্সার স্ক্রিপ্ট কোথায় তোমার?
আর্য খুঁজল, পেলনা। ম্যাডামটি সাংঘাতিক চটে গিয়ে বলছে,
–ইট্স ইন মাই হ্যান্ড। হাউ কেয়ারলেস ফেলো...
–ওহ্। খেয়াল করিনি ম্যাম। আমি কি চলে যেতে পারি?
–না, পারো না। রিডিকিউলাস্। লেখ।

ম্যাম খাতাটি দিয়ে গেল। বড্ড উগ্র পারফিউম লাগিয়েছে। মা বা তনিও এরকম পারফিউম ব্যবহার করে। হয়ত দুর্গন্ধ ঢাকতে। ম্যাডাম এখন বাঘিনীর মতো হল জুড়ে পায়চারি করছে। পারফিউমের সুবাস এখনও পাচ্ছে আর্য। আশ্চর্য। আগের উগ্রতাটা আর নেই। কেমন যেন স্নিগ্ধ হয়ে গেছে চারপাশ। বাঘিনীর মতো হাঁটলেও মাঝে মাঝে হাঁটার গতি কমিয়ে দিচ্ছে, দাঁড়াচ্ছে কয়েক মুহূর্ত। ঠোঁটের ওপর বৃষ্টির ফোঁটার মতো বিন্দু বিন্দু ঘামগুলোকে বেরসিক রুমালের মুছে নিচ্ছে...একটা মস্ত হাই আটকাবার চেষ্টা করল ম্যামন্টি...ঠোঁট দুটো আরও আদুরে হয়ে উঠল। শৈলেশদা বলত, নারীর চোখ আর ঠোঁট নাকি সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং। ইন্টারেস্টিং লাগছিল আর্যরও। ম্যামটা এমন কিছু দেখতে নয়, তবু যখন ওর সামনে দাঁড়িয়ে একবার আর্ধবৃত্তাকারে শরীরটাকে আঁচলের কোনটা খুঁজে নিচ্ছিল...আর্ঘ মনে মনে বলে উঠছিল হোল্ড। কোমরের নিটোল ভাঁজ, কাঁধের নগ্ন অংশে কুচো চুলের দুষ্টু মেজাজ, ভাঁজ খাওয়া আঁচলের প্লিটেয় মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসা একটা স্পষ্ট ক্লিভেজ...আর্য দাঁড়িয়ে বলল,
–ম্যাম আমার পেন্সিলটা ব্যাগে রয়ে গেছে। নিয়ে আসব প্লিজ? জন্য আজও নানা রকম শিস মজুত থাকে। শুরু করল আর্য – পরতে পরতে প্রতিকৃত হচ্ছে মুখটা। পরীক্ষা শেষের পনেরো মিনিট আগে যে ছিঁড়ে নেবে দুটি পাতা। দিয়ে যাবে দিদিমনিকে। দিদিমনি যখন নিঃশব্দে তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে, তখন তার পৃথিবীতে মগ্ন।

৩

ব্রজেশ্বর মিত্র যাদবপুর থেক ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে এখন একটা বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। বাড়ি ঘোড়াঘাটায়। হোস্টেলে বন্ধুরা ওকে ঘোড়াশ্বর, ঘাঁটা ব্রেজ ইত্যাদি নামে ডাকত। ব্রজ জানে অফিসেও তাকে আড়ালে ঘাঁট ব্রজ বলে ডাকা হয়। ওর থেকে বছর তিনেকের সিনিয়ার শান্তনুদাও যে এই কোম্পানিতেই থাকবে, তা কি আরও, ও ক্যাম্পাসিং...এর সময় ভেবেছিল? আর থাকল থাকল, এই ব্রাঞ্চেই। সে সব দুঃখ –দৈন্য দুর্দশা তো আছেই, এখন আবার একটা নতুন সংযোজন হয়েছে। নয় নয় করে ন বছর চাকরি হয়ে গেল, ব্রজের বয়স এখন পঁয়ত্রিশ টপকে গেছে, ব্রজ তবু বউ পাচ্ছে না। পাত্রীদেখা, নেহাত কম হয়নি। ব্রজ মাঙ্গলিক, ঠিকুজি কুষ্ঠীর বিচারে এমনিতেই পাত্রী সংখ্যা নগন্য। তাদের বাড়িতে ঠিকুজি কুষ্ঠী না মিলিয়ে বাচ্চা অব্দি পয়দা করা হয় না। এখন বেত্তান্ততা হলো গত তিন বছর ধরে মাপসই পাত্রী পাওয়া গেছে পাঁচটা। তার আগে নাকি ব্রজের বৈবাহিক যোগ ছিল না। তা, পাঁচটি পাত্রীর মধ্যে শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে চারটে পাত্রীই বেশ অছন্দসই ছিল। ব্রজ পাত্রী দেখে আসার পর বাথরুমে সিগারেট খেয়েছিল, মিউজিক সিস্টেমে গজল শুনেছিল, তার পরের দিন সেন্ট মেখে আফিসে গিয়েছিল। করছিল সবই, কিন্তু সইল না। চার-চারটে পাত্রীই তাকে নাকচ করেছে। লজ্জায় অপমানে পাঁচনম্বরটাকে সে-ই নাকচ করে দিয়েছিল। আর এই খবরগুলো ঐসময় রাষ্ট্র করেছে শান্তনুদা। এখন টেকা দায়। আর শান্তনুদার কানে খবর পৌঁছে দিয়েছে তাদের পাড়ার গুলতানি, শান্তনুদার পিসতুতো বোন। গুলতানিও এখন তার সঙ্গে মশকরা করছে। এমন কতদিন গেছে বাচ্চা মেয়েটাকে সাইকেলে করে ইস্কুল পৌঁছে দিয়েছে ব্রজ বর্ষা বাদলে রাস্তা ঘাটে জল জমে যেত বলে। ক্লাস ফাইভ থেকে টুয়েল্ভ পর্যন্ত রোজ সকাল সন্ধ্যা পড়া দেখাতে যেত গুলতানি ব্রজমাস্টারের কাছে। এখন সেই এক ফোঁটা মেয়েটাও চুকলি করছে। গুল্তানি ওর থেকে খুব কম করে বছর দশেকের ছোট। তোকে ফিসিক্সে পাঁচানব্বই পাওয়ালুম, আর তুই আমার বিয়েতে কাঠি করছিস গুলতানি...ফোস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল ব্রজেশ্বর। ঘরে বাইরে জেরবার হয়ে গিয়ে ব্রজ চাকরি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাই এই পরীক্ষায় বসা. গত এক বছর ধরে প্রস্তুতি নিয়েছে সে। কঠোর প্রস্তুতি। বাড়ির সবাইতে ধরেই নিয়েছে ব্রজটা ব্রোম্ভচারী হয়ে গেল...। তাই সই। হঠাৎ পরীক্ষা পরিদর্শিকা দিদিমনি ভীষণ রেগে ধেয়ে গেলেন একদম শেষের দিকের তিন নম্বর বেঞ্চে। ব্রজ দ্রুত উত্তর লিখতে লিখতে শুনতে পেল দিদিমনি ভীষণ খিঁচিয়ে বলছেন,

-হোয়াই আর ইউ টকিং...?
তার উত্তরটা শুনে ব্রজ ঘাড় ঘুড়িয়ে থ হয়ে গেল,
-কোথায় দিদিমনি?
এ বাব্বা। দিদিমনির কী বেইজ্জতি। গুলতানিটার আর বোধ হল না। এসব জায়গায় ম্যাম বলতে হয়। সারা রাস্তা শেখাতে শেখাতে এসেছে ওকে ব্রজেশ্বর, কীভাবে সময় বাঁচিয়ে প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। তার এই ফল। ব্রজ মাথা ঘুরিয়ে নিজের উত্তরপত্রে মন দিল। গুলতনি কথাটাই বা কার সঙ্গে বলছে, পাশের পাঞ্জাবী ছেলেটার সঙ্গে? গাধাটা তে বুঝবে না, এসব ছেলেগুলো সুবিধার হয় না। ব্রজর খুব ইচ্ছে করছিল গুলতানির কানটা মুলে দিয়ে আসতে। এ কি অসভ্যতা। আগের সপ্তাহে গুলতানি এসে হাজির ভর দুপুরে। বলল|
-ব্রজদা, সামনের রবিবার তোমার সঙ্গে যাব।
-কেন? নিজে যাবি।
-না তোমার সঙ্গে যাব।
গুলতানি এমনই। খুব সোজা। কিন্তু ভীষণ ধারালো। ওর ভালো নামটা অনেক চেষ্টা করেও মনে করতে পারল না ব্রজেশ্বর। পাড়ায় সবাই ওকে গুলতানি বলেই ডাকে। বিশ্ব-বখা একটি মেয়ে। দিনরাত ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা মারছে। মুখের ভাষা রাস্তার রংবাজ মস্তানদের মতো। চলাফেরাও সেরকম। শুধু ব্রজর সামনে একটু ভদ্রভাবে কথা বলে। কারণ জিজ্ঞাসা করে দ্যেখ এর ওপর অনাবশ্যক জোর দিয়ে বলে,
-হাজার হলেও তুমি মাস্টার।
-আর তুই মাস্টারের কুলাঙ্গার ছাত্রী।
-মাইরি বলছি, তুমি না থাকলে ফ্রিজিক্সটা নিয়ে পড়তে পারতাম না।
গুলতনি ছাত্রী ভালো সবকটা ফার্স্টক্লাস বি এস সি এম এস সি। তাদের বাড়িতে গুলতানির যাতায়াত অবধি। ব্রজের বাবার দাবার পার্টনার গুলতানি। বৌদিদের পি এন পি সি র গেজেট গুলতানি। মায়ের রান্নার প্রথম সমঝদার গুল্তানি। তবু গুল্তানির ভালো নামটা মনে পড়ছে না ব্রজেশ্বরের। হাতের স্পিড তার বেশ ভালো। কিন্তু আজ কেন যেন, পেন, সরছে না। মাঝে মাঝে উত্তর জেনেও থেমে যাচ্ছে। দিদিমনিটি একটু অদ্ভুত চোখে তাকাচ্ছে তার দিকে। ব্রজর কি মাথার ব্যামো দেখা দিয়েছে? তাকে কি ভীষণ বিয়ে পাগলা লাগছে? কি জ্বালা। এসবের সঙ্গে পবীক্ষার কী সম্পর্ক? যেমন কোনও রকম সম্পর্ক নেই গুলতানি ভালো নামের সঙ্গে। তবুও প্রাণ আঁকুপাঁকু, মন উথাল পাতাল একটা ভালো নামের জন্য। দিদিমনিটি কড়া হলেও মায়া দয়া আছে বলেই মনে হচ্ছে। গুল্তানির পেছনে বসা বয়স্ক লোকটিকে বেশ সাহায্য করল তখন। ব্রজর দুর্দমনীয় ইচ্ছে হল, দিদিমনিকে জিজ্ঞেস করে শেষের দিকে বসা লাল হলুদ চুড়িদার পরা মেয়েটার ভালো নামটা কি? আর গুল্তানি মাংলিক না হলেও যে কিছু য়ায আসে না, এটা বুঝতে পেরেই কলম চলছেনা ব্রজেশ্বরের।

৪

নীহারিকার আজ শেষ দিন। আর মাত্র ঘন্টা তিনেক। তারপরেই সে মুক্ত। এখানে চাকরিটা তার মন্দ ছিল না। বেশ গোছানো অর্থ উপার্জন, পরিচিত পরিবেশ। তবুও হলটাকে আজকে অদ্ভুতভাবে অপরিচিত মনে হচ্ছে তার। হয়ত শেষ দিন তাই। হলটি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত, তাই বাইরের গুমোট গরমটা বোঝা যাচ্ছে না। না হলে বাইরেটা নিষ্ছিন্দ্র গুমোট গরমে হাঁস-ফাঁস করছে। তার ছেলেবেলার মতো আবহাওয়া আজ। তার ছেলেবেলায় বাবা-মা নেই। কাকা-কাকি আছে। খুড়তুতো ভাই কাজল আছে, আছে খুড়তুতো বোন কমলিকা। ছেলেবেলা থেকেই তার প্রতি কাকার আল্হাদটা ভীষণ বেশি বলে, ক্ল্যাশ ব্যাকে ছোটবেলাকে ঠিক সাদা-কালোয় রাখতে পারে নাও। পারেনা আবহসঙ্গীতে ভায়োলিনের করুণ সুর শুনতে, সংলাপের মাঝে নিরন্তর হেঁচকি দেওয়া কান্নার স্মৃতি মনে করতে। মনে নেই তার এসব কিছু। কাকিমা মানুষটা ভালোবাসাটাকে ঠিক ব্যালেন্স করে রাখতে পারেনি কোনদিনই। কখনও এদিকে একটা হাইড্রোজেন পরমানু বেশি যোগ করত, ওদিকে বেমক্কা অক্সিজেনের অনু বেড়ে গিয়ে বিস্ফোরণ ঘটাবার উপক্রম হতো। নীহারিকাকে অন্ধের মতো অনু-পরমাণু বিলিয়ে গেছে কাকিমা। খুড়তুতো ভাই – বোন দুটি অভিমানে মুখ ফিরিয়েছে। কাজল যে বার এইচ এস এ দুটো বিষয়ে ব্যাক পেল, গলায় দড়ি দিতে গেল, বাঁচিয়েছিল নীহারিকা। যেদিন কাজলের দরজা বন্ধ করার শব্দটায় ভীষণ কাঁপন ধরিয়েছিল ওর শরীরে। কিছু না বুঝেই প্রাণপণ চিৎকার করতে করতে দরজায় ধাক্কা দিয়ে যাচ্ছিল ও। তাদের কলোনি পাড়ার ভাড়া বাড়িতে লোক জড়ো হয়ে গিয়েছিল। পাড়ার বাপিনদা, মন্টুকাকু মিলে দরজা ভেঙে বাঁচিয়েছিল কাজলকে। সিরাজ ডাক্তার ডেকে

এনেছিল। জনি পাগলের মতো জলের ঝাপটা দিচ্ছিল কাজলের মুখে। সবাই যখন কাজলকে নিয়ে ব্যস্ত তখন ওর পাড়ার টেবিলটার ওপর ঘাপটি মেরে বসেছিল ভাঁজ করা কাগজটা। নীহারিকাকে লেখা কাজলের চিঠি। ওটা একটা অশ্লীল প্রমপত্র ছিল। ছিল সুইসাইড নোটও। ছিল নীহারিকার ওদের ছেড়ে চলে যাবার প্রস্তুতি পর্বের নিষিদ্ধ ঘোষণা।

নীহারিকা এখন এম.এ ফাইনাল দিয়েছে। বিষয় ইংরেজি। অভিন্নহৃদয় বন্ধু গীতশ্রীই তাকে অর্থ উপার্জনের সুস্থ পথ দেখিয়েছিল। গীতশ্রীদের বিশাল বাড়িতে শুরু করেছিল ওরা কোচিং সেন্টার নীহারিকা সেই তবে থেকে দেদার ছাত্র পড়ায়। কাজলদের বয়েসের ছাত্র, কমলিকাদের বয়েসী ছাত্রী। ইংরেজী, সাহিত্যের বীজ বপন করে সে ওদের মধ্যে। দক্ষিণ কলকাতায় ছিল সেই কোচিং সেন্টার। দক্ষিণ দক্ষিণায় ভরিয়ে দিতে ওকে। আর ও ভরিয়ে দিত তাদের কলোনি পাড়ায় বাড়িটাকে বিস্ফোরণ ঘটত অহরহ। সেবার পুজোর আগে গীতশ্রী বলল,
–আমাদের কোচিং সেন্টারটাকে আরও বড় করতে হবে বুঝলি। বাবা পাশের জমিসমেত বাড়িটাও কিনেছে। ওটায় স্কুল তৈরি করব।
–সে তো অনেক জটিল ব্যাপার। কী ভাবে করবি?
–প্রফেশানাল কোর্স পড়ানোর ব্যবস্থা করব এই বাড়িটার দো–তলায়।
–আর তোর বাবা মা?
একটা সহানুভূতি মেশানো তাচ্ছিল্য নিয়ে বলেছিল গীতশ্রী,
–ওরা সাদার্ণ এভিনিউ এ নিজেদের ফ্ল্যাটে থাকবে। এ বাড়িটা তো আমার নামেই। অসুবিধা হবে না।

গীতশ্রীরা তো চিরকালই বড়োলোক। নানাদিকে নানা ব্যবসা। স্কুলের ব্যবসাটা হলে আপত্তির কোনও কারণ ছিল না। তাই বাবা মা অক্লেশে স্থানান্তরিত হয় এ বাড়ি থেকে ও ফ্ল্যাটে। সুযোগ বুঝে নীহারিকাও কমলিকাকে ঢুকিয়ে দিয়েছিল ওখানে পড়াতে। কমলিকার দায়িত্বে ছোট ক্লাসগুলোর কোচিং চলত। চমৎকার হাতের কাজ জানে কমলিকা। বাচ্চাগুলোকে গানে–নাচে–গল্পে–ছবি আঁকিয় ভরিয়ে রাখত কমলিকা। ততদিনে পাশের জমিতে গীতশ্রীদের মালিকিসত্বে বেসরকারি স্কুল খুলে গেছে। রমরমিয়ে চলছে সে ব্যবসা। আরও বড় হচ্ছে স্কুল। গীতশ্রীর হরেকরকম বিশেষ বন্ধুর মধ্যে এ সময় অর্ধেন্দু রায় বিশেষ সাহায্য করেছিল। সাদার্ণ এভ্যিনিউয়ের ফ্ল্যাটে বসবাসকারী বাবা ও গীতশ্রীকে পুরোদস্তুর ব্যবসায়িক করে তুলতে একটুও ফাঁক রাখেননি। গীতশ্রী আর অর্ধেন্দুর যৌথ মালিকানায় স্কুলের আরও দুটো বড়ো বিল্ডিং উঠে গেছে ততদিনে। কমলিকাও তখন বি. এড করে ফেলেছে। এম. এড এর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। নীহারিকার আর ঠাঁই নড়েনি। সেও ভেবেছিল ডিসট্যান্সে যদি বি. এড. টা করে নেওয়া যায়। যেত। অনায়াসেই যেত। আরেকটু পড়ি, আরেকটু পড়াই –আরেকটু পরের চক্করে আর হয়নি।

তখন স্কুল বারো ক্লাস পর্যন্ত হয়ে গেছে। ছুটছেও পুরোদমে। স্কুলের পর বিকেল পাঁচটা থেকে শুরু হয় তাদের আদি পাঠাভ্যাস – সনাতন সেই কোচিং সেন্টার। অনেক কিছুই বদলে গিয়েছিল, নীহারিকা ছাড়া। তার চেহারা পঁচিশ আর পঁয়ত্রিশের হেরফের ধরতে দেয় না। তার অভিব্যক্তি কঠিন কোমলকে গুলিয়ে দেয় মেঘ–বৃষ্টির মতো। তার শাড়িপরা দেহ সৌষ্ঠবকে পুরুষেরা পেতে চায় অশ্লেষে, স্নেহে, রতিতে, মৈথুনে, মাধুর্যে। কলোনির ভাড়া বাড়ি ছেড়ে দক্ষিণ কলকাতার নতুন ফ্ল্যাটে আসে কমলিকা, তার মা–বাবা–দাদাকে নিয়ে। নীহারিকা আসে কাকিমার হাতে হাত লাগাতে, মা–মেয়ের ঝগড়া থামাতে, প্যারালাইসিসে অথর্ব কাকাকে বইপড়ে শোনাতে, গান শোনাতে...আর কাজলের চোখকে ভয় পেতে। নিজের মনেই হাসছিল নীহারিকা–জীবনের এই অংশটায় করুণ সুরের আবহ রমরমিয়ে চলে... যদি প্রেম দিলে না প্রানে... এরপর একদিন কমলিকা প্রায় হঠাৎই ঘোষণা করল, সে অর্ধেন্দু রায়কে বিয়ে করতে চলেছে। সিনিয়ার স্কুলের অধ্যক্ষার পদে তাকে আসীন করেছে স্বয়ং গীতশ্রী সেনগুপ্ত। মানুষের জীবনে অগনিত বিশেষ থাকে দু–একটাকে দান–ধ্যান করলে পুণ্য হয়। গীতশ্রীরও হয়েছে। কমলিকা সেদিন খুব নরম করুণ সুরে বলেছিল,
–আমি জানি, তোর খারাপ লাগছে নীরুদি। আসলে তোর তো বি.এড টাও নেই। যাক গে, তুই ভাবিস না। তোর কোচিং সেন্টারের গায়ে একটুও আঁচ লাগতে দেব না। গীতশ্রী যতই চেষ্টা করুক...।

শেষের কথাগুলো আর কানে যায়নি নীহারিকার। ভীষণ জোরে বাজ পড়েছিল ধারে কাছে কোথাও। এরপরেও কোচিং অথবা কলোনির ভাড়াবাড়ি ছাড়েনি নীহারিকা। পাঁচ বছর লাগাতার চেষ্টারপর এ বছর স্কুল সার্ভিস পরীক্ষার দীর্ঘ সফরে কৃতকার্য হবার পরও ঠিক দশ মাসের মাথায় এস. এস. সি তার জননীকৃত্য সম্পাদন করল।

গোসাবায় তার স্কুল। দিন পনেরোর মধ্যে জয়নিং। গীতশ্রীর কাছে গতকাল সে এসেছিল ইস্তিফাপত্র দিতে- দরকার ছিল না হয়ত, তবুতো ছিল। সময় বা সম্পর্কও তো রেজিগনেশানের দাবি করে। গতকাল সারাদিন বৃষ্টি হয়েছিল। ভেজা শাড়ি, মুক্তির আবেশ, পুরনো অভ্যেস ছাড়ানোর যন্ত্রনা, সব মিলিয়ে শিথিল ছিল তার পদক্ষেপ। কলোনির বাসস্ট্যান্ডে নেমে দেখল লোড শোডিং। অভ্যাসের পথে ভুল হয় না-এই ভুলটা ছিল মনে। গীতশ্রীর শেষ অনুরোধটা রাখবে সে, এমনটাই কথা দিয়ে এসেছিল নীহারিকা। এই কম্পিটেটিভ পরীক্ষাটা শেষ ইনভিজিলেশানটা করে দিয়ে যাবে। পরদিন রবিবার, সেদিনই পরীক্ষা। অসুবিধে নেই তারও। আইনের এই একটা ফাঁকে তদারকি করে যাবে সে। ছেড়েই তো যাচ্ছে, না হয় বেআইনি পরিদর্শিকা হলোই সে একবার। নীহারিকা জানে এর যে লিখিত নথি থাকবে, তাতে তার নাম থাকবে না, কোনোদিনও থাকেনি। বাড়ির সামনে পৌছনো অব্দি সে এইসব আলুথালু চিন্তা ছাড়া আর কোনও স্পর্শ পায়নি। দরজার তালাটা খোলা অব্দিও বিশুদ্ধ সাদা কালো আবহটা ছিল। তারপর কারা যেন উপড়ে নিল তার সাদাটুকু...কালোটুকু...একের পর এক থাবায় ছিঁড়ে পড়তে চাইল তার মাতৃত্বের সুধাধার...তার নিটোল স্তন দুটি...চুলের মুঠি ধরে উলঙ্গ করে ফেলা হল তাকে। তার নাভিতে, পিঠে জানুতে হিংস্র শ্বাপদের মতো ছোবল মারতে লাগল পুরুষাঙ্গ। যোনিপথে অবিশ্রান্ত রক্তস্রোত। তার চিৎকার সেদিন আর শুনতে পাইনি ছেলেবেলার কলোনি পাড়ার কোনো মানুষ। মুখে গামছা ঢুকিয়ে মূক করে রেখেছিল কাজল- এরপর বাপিনদার হয়ে গেলে জনি- জনির হয়ে গেলে কাজল...কাজলের হয়ে গেলে মক্ত কাকু...মক্তকাকু হয়ে গেলে সিরাজ...সিরাজের প্যান্টের জিপ বন্ধ হলে...ভোজালির।

৫

এইসব কম্পিটিটিভ পরীক্ষা যখন তাদের মতো এ প্লাস ক্যাটাগোরির স্কুল ভাড়া নেয় তখনই কমলিকার চোখে ভাসে ব্যাংককের আকাশনীল সমুদ্রটা। গীতশ্রী তার কো প্রডিউসারের জন্য পার্টি আরগানাইজ করে। অর্ধেন্দুর ল্যাপটপে টোপ ভাসে পরবর্তী প্রস্তুতির জন্য। তাদের স্কুল বিল্ডিং তিনটেই সেন্ট্রালাইজ্ড এ.সি। আছে স্যুইমিং পুল, তিনটে বড় খেলার মাঠ, বাস্কেটবল, হ্যান্ডবল খেলার পৃথক ফ্লোরে একটি করে হলঘর। সেগুলিতে আবার চারটি জ্যামিতিক কোনে ক্যামেরা বসানো। তারা তিন মনির পৃথক পৃথক চেম্বারে বসে বিশাল এল সি ডি স্ক্রীনে ক্যামেরার ফুটেজ দেখে। নজরদারি করে। গীতশ্রী আজ একটু দেরি করে ফেলেছে। কত দিক সামলাবে। কবি সম্মেলন, সদস্য প্রয়াত চিত্র পরিচালকের কাছের বন্ধু হিসেবে নিউজ চ্যানেলে মরমি সংলাপ উচ্চারণ- তারপর মেহেতার পার্টি সেরে ফিরতে প্রায় ভোর তিনটে বেজে গেল। কিছু করার নেই, সামনেই তার সম্পাদিত নতুন পত্রিকার উদ্বোধন আছে, আছে মেহেতার সঙ্গে জয়েন্ট প্রোডাকশানে নতুন ছবি। অন্যধরনের ছবি। মার্কেটিং স্ট্যাটেজি নিয়ে মাথা ঘামাতে হচ্ছে বিস্তর। একে তো দেরি, তার ওপর এসে দেখে নীহারিকা আসেনি। মোবাইলও সুইচ্ড় অফ্। এমনটাতো হয় না। কথা দিয়ে ছিল নীহারিকা। তবু এল না। অর্ধেন্দু কমলিকা ততক্ষণে বিকল্প পরিদর্শিকা হিসেবে জুনিয়ার সেকশানের ইন চার্জ মাধুরীকে দু-নম্বর হলে পাঠিয়ে দিয়েছে। ব্যাঙ্ক কথাও শোনাতে ছাড়ল না কমলিকা। পরীক্ষা শুরু হবার আধ ঘন্টা পর থেকে কখনও গীতশ্রী কখনও কমলিকা একবার করে ঘুরে আসে। অর্ধেন্দু বিশেষ যায় না। পরীক্ষার কর্মকর্তাদের সঙ্গে ব্যস্ত থাকে বা রাখে। হাতে কফির কাপটা নিয়ে পেপারে চোখ বোলাচ্ছিল গীতশ্রী –উত্তর চব্বিশ পরগনায় মুরাতিপুর গ্রামে এক কিশোরীকে কয়েকজন যুবক মিলে গাছতলায় ধর্ষণ করেছে. মেয়েটির নাম দুর্গা...। ধূর। রোজ এক কথা। মিডিয়ার তো আর কোনও কাজ নেই। মোবাইলটা বেজে উঠল গীতশ্রীর...সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলং..মাতরম। - ওপাশ থেকে কমলিকার গলা,

-যাচ্ছ তো মিছিলে?

-হু। মুরাতিপুর কেসটায় তো?

-আরে না। তার আগেরটায় বারাসাতে...

-ওহ্ হো। হ্যাঁ বলেছিলি। শ্যামাশ্রীরা যাবে?

-হ্যাঁ। ওদের তো নাটকের পুরো গ্রুপটাই যাবে শুনছি।

-আর কৌলীক?

-ও বাবা। ও আবার যাবেনা ? আঁতলামির এতবড় সুযোগ ছাড়বে না কি?

-যাহ্। তা বলিস না। ছেলেটা বলে ভালো। আমাদের ওপর তাতে চাপটা কম আসে। হ্যারে নাগপাশেই মুক্তি নামিয়ে দিয়েছে গরবিনী?

-নামাবে। তাই তো মধুছন্দার এত তোড়জোড়। বল্ল সাদা কোষা সিল্ক পরবে।

-তুই সাদাই পরবি?

-না, না, এটাতো ক্রিমেশান নয়। প্রতিবাদ মিছিল। তবে অফ কালারে যাওয়াটাই ভালো।

-কবিদের দিকটা অর্ধেন্দু দেখছে তো?

-হ্যাঁ গো। আর স্টুডেন্টস্?
-ওটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। মধুছন্দাকে বলা আছে। ও স্টুডেন্ট ইউনিয়ান গুলোর সঙ্গে কথা বলে নিয়েছে।
নিজের যত্ন-লালিত নখগুলো দেখতে দেখতে গীতশ্রীর চোখ গেল এল.সি.ডি. স্ক্রীনে। এ কী দেখছেও?
-কমলিকা, দু নম্বর হলের ফুটেজটা দ্যাখ। অর্ধেন্দু কী করছে এখানে?
গীতশ্রীর গলার স্বরটা কেমন যেন অস্বাভাবিক শোনাচ্ছিল। অলসভাবে এল. সি. ডি তে চোখ রাখতে গিয়ে সেও আর স্বাভাবিক থাকতে পারল না। দেখল. অর্ধেন্দু গ্লাসে গ্লাসে নীল রঙের একটা তরল ঢেলে প্রত্যেক পরীক্ষার হাতে তুলে দিচ্ছে। আর মাধুরীই বা কোথায়? নীহারিকা এলো কোথা থেকে? লেট হলেও এখানে দেখা করে যাওয়ার কথা। আর কিছু না ভেবে সোজা গীতশ্রীর কাছে চলে এল কমলিকা। এসি তেও দর্‌দর্‌ করে ঘামছে সে। গীতশ্রীও ভয়ে সিঁটিয়ে দেখছে সি সি টিভি ক্যামেরার ফুটেজ। নতুন মাধুরী। ও এটা কী করছে? এ কি| ওরকম অসভ্যের মতো শাড়ি খুলে ফেলছে কেন? কমলিকা মোবাইলে ধরার চেষ্টা করছে অর্ধেন্দুকে। গীতশ্রীর চেম্বারে তাদের পুরনো পিয়ন সিরাজ ঢুকে জিজ্ঞেস করল,
-মিছিলের জন্য মোমবাতি দিয়ে গেছে কাজলদা। কোথায় রাখব?
উত্তর দেবার সময় নেই। ওরা ছুটেছে অর্ধেন্দুর চেম্বারে। অর্ধেন্দু শান্ত মুখে ব্রেকফাস্ট সারছিল। প্রাতরাশ চেম্বারেই করে সে। তার খাস আদমি জন ডিসুজা তখন পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। ঘরে ঢুকেই কমলিকা প্রায ঝাঁপিয়ে পড়ল।
-তুমি কি পাগল হয়ে গেছ? কী ঢেলে দিচ্ছিলে গ্লাসে গ্লাসে? দু-নম্বর হলে?
গীতশ্রী চেঁচিয়ে উঠল,
-নীহারিকা যে আসবে, আগে বলনি কেন? না কি এতদিন পর হঠাৎ পিরিত উথলে উঠল?
অর্ধেন্দু বিস্ময়ের প্রথম চোট্‌টা সামলে কড়া গলায় বলে উঠল,
-দুজনের হ্যাংওভার এখনও কাটেনি নাকি? সকাল সকাল কীসব রাবিশ বকছে। এই তো এলাম। গেছি কোথায় ওই বিল্ডিং এ? বাপিনটাকে দিয়ে আর চলবে না, রোজ এত দেরি করে। গাড়ি বার করতেই ওর...
কথা শেষ হলো না অর্ধেন্দুর। সি সি টিভি ফুটেজ তার চোখকে বিস্ফরিত করে দিল - নীহারিকা? কাল তো সব শেষ করেই বেরিয়েছিল- তাহলে? তাহলে এ কী করে সম্ভব? – দু-নম্বর হলে নীল কেরোসিনে আগুন জ্বালিয়ে রাশি রাশি মোমবাতি গলাচ্ছে সবাই। দাঁড়িয়ে আছে উলঙ্গ মাধুরী। নীহারিকা গলানো মোম লেপে দিচ্ছে তার সারা শরীরে...তার গোপন অঙ্গে, যা এখন আর গোপন নেই। এক বয়স্ক ভদ্রলোক ফাউন্টেন পেনে গলানো মোম ভরে নিজের চোখে ঢেলে দিলেন...অগ্নিগর্ভ মোম। একটা খ্যাপাটে ছেলে পরীক্ষার খাতার পাতা ছিঁড়ে ওড়াচ্ছে...এঁকেছিল নীহারিকার মুখ...মাধুরীর ন্যুড প্রতিকৃতি...কমলিকার স্তন...গীতশ্রীর নগ্ন পিঠ...করবিনী নাট্য সংস্থার সব নারীর উলঙ্গ প্রতিকৃতি...। সেসব পাতা এখান গলা মোমে ভেজাচ্ছে। একটা বোকাটে ছেলে বুকে ঠেসে ধরেছে একটা মেয়েকে। গলিত মোমের সরোবরে তারই ডুব দিল সবার আগে। নীহারিকার মোমের প্রতিমা গড়া শেষ। বয়স্ক মানুষটি মোমে অন্ধ, তবুও এগিয়ে এসে কাঁপা কাঁপা হাতে মাধুরীর মোমের প্রতিমার ঠোঁটে গুঁজে দিলেন সন্দেশ। তপ্ত অগ্নি প্রবাহে ডুবে যেতে লাগল দু-নম্বর হল ঘর।

প্রতিমার বিসর্জন...গলিত মোমের প্রস্রবনে। আহুতি দিচ্ছে এরা কারা? সিরাজ, কাজল, বাপিন সরকার, মন্টু রায়, জনি মেমামের যোগান দিয়ে পেরে উঠছে না। জ্বলন্ত মোমের আঁচ পুড়িয়ে দিচ্ছে ওদের প্যান্টের জিপ। পুড়িয়ে দিচ্ছে মাধুরী নীহারিকাদের যোনি। পুড়ছে মিছিলের মোমেরা, পুড়ছে টিয়ার ঘ্যাম, পুরছে হোস পাইপের জল...পুড়ছে ডিসেম্বেরের বৃষ্টিভেজা রাত...পুড়ছে ইন্ডিয়া গেট...পুড়ছে ঢাকির ঢাক...পুড়ে যাচ্ছে মোমের শহর...মোমের দেশ...মোমের সভ্যতা। কারা যেন পুড়ে যেতে যেতে বলছে-ঠাকুর থাকবে কতক্ষণ?...ট্রাফির সিগ্‌নালের লাল আলোয় বাজছে বন্দেমাতরম। ভেসে আসছে জেবরা ক্রসিং ধরে গোসাবার ধানক্ষেতের ইস্কুলের প্রার্থনা সঙ্গীত-

-শুভ্র-জ্যোৎস্না – পুলকিত – যামিনীং/ফুল্লকুসুমিত দ্রুমদল শোভিনীর/সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিনীং/সুখদাং বরদাং মাতরম্/বন্দেমাতরম্...।